[19:42, 20/06/2020] Abbu R2: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

বই নং ৩৭। www.motaher21.net

اقْرَ

" পড়ো !"

" Read !"

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ

পড়ুন আপনার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

সূরা সম্পর্কিত তথ্যঃ

নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, সূরা আলাক থেকেই ওহীর সূচনা হয় এবং এ সূরার প্রথম পাঁচটি আয়াত مَالَمْ يَعْلَمْ পর্যন্ত সর্ব প্রথম নাযিল হয়। [দেখুন, বুখারী: ৬৯৮২, মুসলিম: ১৬০] অধিকাংশ আলেম এ বিষয়ে একমত। কেউ কেউ সূরা আল-মুদ্দাসসিরকে প্রথম সূরা এবং কেউ সূরা ফাতেহাকে সর্বপ্রথম সূরা বলে অভিহিত করেছেন। তবে প্রথমোক্ত মতটিই বিশুদ্ধ। [আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন: ১/৯৩]

(৯৬-আলাক্ব) : নাযিল হওয়ার সময়-কাল :

এই সূরাটির দু'টি অংশ। প্রথম অংশটি اقْرَأْ থেকে শুরু হয়ে পঞ্চম আয়াতে مَا لَمْ يَعْلَمْ গিয়ে শেষ হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশটি كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ থেকে শুরু হয়ে সূরার শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রথম অংশটি যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ সর্বপ্রথম অহী এ ব্যাপারে উম্মাতে মুসলিমার আলেম সমাজের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ একমত। এ প্রসংগে ইমাম আহমাদ, বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ অসংখ্য সনদের মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তা সর্বাধিক সহীহ হাদীস হিসেবে গণ্য। এ হাদীসে হযরত আয়েশা নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ওহী শুরু হবার সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ইবনে আব্বাস (রা.,, আবু মূসা আশ'আরী (রা.) ও সাহাবীগণের

একটি দলও একথা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম কুরআনের এই আয়াতগুলোই নাযিল হয়েছিল। আর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হারাম শরীফে নামায পড়া শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁকে হুমকি দিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে তখন দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়।

(৯৬-আলাক্ব) : অহীর সূচনা :

মুহাদ্দিসগণ অহীর সূচনাপর্বের ঘটনা নিজের নিজের সনদের মাধ্যমে ইমাম যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম যুহরী এ ঘটনা হযরত উরওয়া ইবনে যুবাইর থেকে এবং তিনি নিজের খালা হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের (কোন কোন বর্ণনা অনুসারে ভালো স্বপ্নের) মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, মনে হতো যেন দিনের আলোয় তিনি তা দেখছেন। এরপর তিনি নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়েন। এরপর কয়েকদিন হেরা গুহায় অবস্থান করে দিনরাত ইবাদাতের মধ্যে কাটিয়ে দিতে থাকেন। হযরত আয়েশা (রা., তাহান্নুস تحنث শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইমাম যুহরী তা'আব্বুদ تَعَبُّدُ বা ইবাদাত- বন্দেগী শব্দের সাহায্যে এর ব্যাখ্যা করেছেন।এখানে তিনি কোন ধরনের ইবাদাত করতেন? কারণ তখনো পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে ইবাদাতের পদ্ধতি তাঁকে শেখানো হয়নি । ঘর থেকে খাবার- দাবার নিয়ে তিনি কয়েকদিন সেখানে কাটাতেন। তারপর হযরত খাদীজা (রা.) এর কাছে ফিরে আসতেন। তিনি আবার কয়েক দিনের খাবার সামগ্রী তাঁকে যোগাড় করে দিতেন। একদিন তিনি হেরা গুহার মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ তাঁর ওপর ওহী নাযিল হলো। ফেরেশতা এসে তাঁকে বললেন: "পড়ো" এর পর হযরত আয়েশা (রা.) নিজেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: আমি বললাম, "আমি তো পড়তে জানি না।" একথায় ফেরেশতা আমাকে ধরে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন। এমনকি আমি তা সহ্য করার শক্তি প্রায় হারিয়ে ফেল্লাম। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো।" আমি বললাম "আমি তো, পড়তে জানি না।" তিনি দ্বিতীয় বার আমাকে বুকের সাথে ধরে ভয়ানক চাপ দিলেন। আমার সহ্য করার শক্তি প্রায় শেষ হতে লাগলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "পড়ো।" আমি আবার বলালাম, "আমি তো পড়া জানি না।" তিনি তৃতীয় বার আমাকে বুকের সাথে ভয়ানক জোরে চেপে ধরলেন আমার সহ্য করার শক্তি খতম হবার উপক্রম হলো। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ (পড়ো নিজের রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন) এখানে থেকে مَا لَمْ يَعْلَمْ (যা সে জানতো না) পর্যন্ত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁপতে কাঁপতে সেখান থেকে ফিরলেন। তিনি হযরত খাদীজা (রা.) এর কাছে ফিরে এসে বললেন, আমার গায়ে কিছু (চাঁদর-কম্বল) জড়িয়ে দাও! আমার গায়ে কিছু (চাঁদর-কম্বল) জড়িয়ে দাও! তখন তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেয়া হলো। তাঁর মধ্য থেকে ভীতির ভাব দূর গেলে তিনি বললেন: "হে খাদীজা! আমার কি হয়ে গেলো? তারপর তিনি তাঁকে পুরো ঘটনা শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার নিজের জানের ভয় হচ্ছে।" হযরত খাদীজা বললেন: "মোটেই না। বরং খুশী হয়ে যান। আল্লাহর কসম! আল্লাহ কখনো আপনাকে অপমাণিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করেন। সত্য কথা বলেন। (একটি বর্ণনায় বাড়তি বলা হয়েছে, আপনি আমানত পরিশোধ করে দেন,) অসহায় লোকদের বোঝা বহন করেন। নিজে অর্থ উপার্জন করে অভাবীদেরকে দেন। মেহমানদারী করেন। ভালো কাজে সাহায্য করেন।" তারপর তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে ওয়ারাকা ইবনে নওফলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা ছিলেন তাঁর চাচাত ভাই। জাহেলী যুগে তিনি ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আরবী ও

ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল লিখতেন। অত্যন্ত বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে বললেন, ভাইজান! আপনার ভাতিজার ঘটনাটা একটু শুনুন। ওয়ারাকা রসূলুল্লাহকে (সা., বললেন: "ভাবিজা! তুমি কি দেখেছো ?" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা বললেন: "ইনি সেই নামূস (অহী বহনকারী ফেরেশতা) যাকে আল্লাহ মূসার (আ, ওপর নাযিল করেছিলেন। হায়, যদি আমি আপনার নবুয়াতের জামানায় শক্তিশালী যুবক হতাম! হায়, যদি আমি তখন জীবিত থাকি যখন আপনার কওম আপনাকে বের করে দেবে।" রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "এরা আমাকে বের করে দেবে?" ওয়ারাকা বললেন: "হাঁ, কখনো এমনটি হয়নি, আপনি যা নিয়ে এসেছেন কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে এবং তার সাথে শত্রুতা করা হয়নি। যদি আমি আপনার সেই আমলে বেঁচে থাকি তাহলে আপনাকে সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করবো।" কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই ওয়ারাকা ইন্তিকাল করেন।

এ ঘটনা নিজেই একথা প্রকাশ করছে যে, ফেরেশতার আসার এক মূহূর্ত আগেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে নবী বানিয়ে পাঠানো হবে এ সম্পর্কে তিনি বিন্দুবিসর্গও জানতেন না। তাঁর এই জিনিসের প্রত্যাশী বা আকাংক্ষী হওয়া তো দূরের কথা, তাঁর সাথে যে এই ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে, একথা তিনি আদৌ কখনো কল্পনা করতে পারেননি। অহী নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার এভাবে সামনে এসে যাওয়া তাঁর জন্য ছিল একটি আকস্মিক ঘটনা। এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া তাঁর ওপর ঠিক তাই হয়েছে যা একজন বেখবর ব্যক্তির সাথে এত বড় একটি আকস্মিক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। এ কারণেই যখন তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে এগিয়ে আসেন তখন মক্কার লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সব রকমের আপত্তি উঠায় কিন্তু তাদের একজনও একথা বলেনি, আমরা তো আগেই আশংকা করেছিলাম আপনি কোন একটি কিছু হওয়ার দাবি করবেন, কারণ আপনি বেশ কিছু কাল থেকে নবী হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

এ ঘটনা থেকে নবুয়াতের আগে তাঁর জীবন কেমন পবিত্র ছিল এবং তাঁর চরিত্র ও কর্মকাণ্ড কত উন্নত পর্যায়ের ছিল সে কথাও জানা যায়। হযরত খাদীজা (রা.) কোন অল্প বয়স্কা মহিলা ছিলেন না। বরং এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছির পঞ্চান্ন বছর। পনের বছর ধরে তিনি রসূলের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন দুর্বলতা গোপন থাকতে পারে না। বরং এই ঘটনার সময় তাঁর বয়স ছিল পঞ্চান্ন বছর। পনের বছর ধরে তিনি রসূলের জীবন সঙ্গিনী ছিলেন। স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন দুর্বলতা গোপন থাকতে পারে না। এই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনে হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে এমনই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হিসেবে পেয়েছিলেন যে, যখনই তিনি তাঁকে হেরা গুহার ঘটনা শুনান তখনই নির্দ্বিধায় তিনি স্বীকার করে নেন যে, যথার্থই আল্লাহর ফেরেশতা তাঁর কাছে অহী নিয়ে এসেছিলেন। অনুরূপভাবে ওয়ারাকা ইবনে নওফলও মক্কার একজন বয়োবৃদ্ধ বাসিন্দা ছিলেন। তিনি শৈশব থেকে মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহর (সা.) জীবন দেখে আসছিলেন, তাছাড়া পনের বছরের নিকট আত্মীয়তার কারণে তাঁর অবস্থা তিনি আরো গভীরভাবে অবগত ছিলেন। তিনিও এ ঘটনা শুনে একে কোন প্ররোচনা মনে করেননি। বরং শুনার সাথে সাথেই বলে দেন, ইনি সেই একই "নামূস" যিনি মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন। এর অর্থ এই দাঁড়ায় তাঁর মতেও মুহাম্মাদ (সা.) এমনই উন্নত ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, তাঁর নবুয়াতের মর্যাদা লাভ করা কোন বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল না।

দ্বিতীয় অংশ নাযিলের প্রেক্ষাপট রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কা'বা শরীফে ইসলামী পদ্ধতিতে নামায পড়তে শুরু করেন এবং আবু জেহেল তাঁর হুমকি দিয়ে ও ভয় দেখিয়ে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে, ঠিক সে সময় এই সূরার দ্বিতীয় অংশটি নাযিল হয়। দেখা যায়, নবী হবার পর প্রাকশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেবার কাজ শুরু করার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর শেখানো পদ্ধতিতে হারম শরীফে নামায পড়তে শুরু করেন এবং এ কাজটির কারণে কুরাইশরা প্রথমবার অনুভব করে যে, তিনি কোন নতুন দ্বীনের অনুসারী হয়েছেন। অন্য লোকেরা অবাক চোখে এ দৃশ্য দেখছিল। কিন্তু আবু জেহেল জাহেলী শিরা-উপশিরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং সে এভাবে হারম শরীফে ইবাদাত করা যাবে না বলে তাঁকে ধমকাতে থাকে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে কয়েকটি হাদীসে আবু জেহেলের এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন দুষ্কৃতি উল্লেখিত হয়েছে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন: আবু জেহেল কুরাইশদেরকে জিজ্ঞেস করে, "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কি তোমাদের সামনে যমীনের ওপর মুখ রাখছে?" লোকেরা জবাব দেয়, "হাঁ"। একথায় সে বলল, "লাত ও উয্যার কসম, যদি আমি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি তাহলে তার ঘাড়ে পা রেখে দেবো এবং মাটিতে তার মুখ রগড়ে দেবো।" তারপর একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখে সে তাঁর ঘাড়ের ওপর পা রাখার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ লোকেরা দেখে সে পিছনের দিকে সরে আসছে এবং কোন জিনিস থেকে নিজের মুখ বাঁচাবার চেষ্টা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার কি হয়েছে? সে বলে, আমার ও তার মাঝখানে আগুনের একটি পরিখা, একটি ভয়াবহ জিনিস ও কিছু ডানা ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সে যদি আমার ধারে কাছে ঘেঁসতো তাহলে ফেরেশতারা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো। (আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনুল মুনযির, ইবনে মারদুইয়া, আবু নাঈম ইসফাহানী ও বায়হাকী)

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত: আবু জেহেল বলে, যদি আমি মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কা'বার কাছে নামায পড়তে দেখি তাহলে পায়ের নীচে তার ঘাড় চেপে ধরবো। একথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে পৌঁছে যায়। তিনি বলেন, যদি সে এমনটি করে তাহলে ফেরেশতারা প্রকাশ্যে তাকে এসে ধরবে। (বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, আবদুর রাজ্জাক, আবদ ইবনে হুমাইদ, ইবনুল মুনযির ও ইবনে মারদুইয়া)

ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাকামে ইবরাহীমে নামায পড়ছিলেন, আবু জেহেল সেদিক দিয়ে যাচ্ছিল। সে বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এ থেকে নিষেধ করিনি ? একথা বলে সে তাঁকে ধমকাতে শুরু করলো। জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কঠোরভাবে ধমক দিলেন। তাঁর ধমকানি শুনে সে বললো, হে মুহাম্মাদ! কিসের জোরে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো? আল্লাহর কসম! এই উপত্যকায় আমার সমর্থকদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে জারীর, ইবনে আবী শাইবা, ইবনুল মুনযির, তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়া)

এ ঘটনাবলীর কারণে كَلَّاۤ اِنَّ الۡاِنۡسَانَ لَیَطۡغٰۤی থেকে সূরা যে অংশটি শুরু হচ্ছে সেটি নাযিল হয়। কুরআনের এই সূরাটিতে এই অংশটিকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে স্বাভাবিকভাবে এর মর্যাদা তাই হওয়া উচিত। কারণ প্রথম অহী নাযিল হবার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের প্রথম প্রকাশ করেন নামাযের মাধ্যমে এবং এই ঘটনার ভিত্তিতেই কাফেরদের সাথে তাঁর প্রথম সংঘাত হয়।

নাবী (সাঃ)-এর সহধর্মিনী আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: ঘুমন্তঅবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে নাবী (সাঃ)-এর প্রতি প্রথম ওয়াহী অবতরণ শুরু করা হয়েছিল। এ সময় তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা সকালের আলোর মতই সুস্পষ্ট হত। এরপর নির্জনতা তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি হেরা গুহায় চলে যেতেন এবং পরিবার পরিজনের কাছে আসার পূর্বে সেখানে লাগাতার কয়েকদিন পর্যন্ত তাহান্নুছ বা ধ্যান করতেন। তাহান্নুছ অর্থ: বিশেষ পদ্ধতিতে ইবাদত করা। এজন্য তিনি কিছু খাবার নিয়ে যেতেন। এরপর তিনি খাদিজাহ (রাঃ)-এর কাছে ফিরে এসে আবার সে রকম কিছু খাবার নিয়ে যেতেন। শেষে হেরা গুহায় থাকা অবস্থায় হঠাৎ তাঁর কাছে সত্যবাণী এসে পৌঁছে। ফেরেশতা (জিবরীল) তাঁর কাছে এসে বললেন: পড়ুন! রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমি পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: এরপর তিনি আমাকে ধরে খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতে আমি অসহনীয় কষ্ট অনুভব করি। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন: পড়ুন! আমি বললাম: আমি পড়তে জানি না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: এরপর তিনি আমাকে ধরে দ্বিতীয়বার জোরে আলিঙ্গন করলেন। এতেও আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব করি। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন: পড়ুন! আমি বললাম: আমি পড়তে জানি না। এরপর তিনি আমাকে তৃতীয়বার খুব জোরে আলিঙ্গন করলেন। এবারও আমি খুব কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন:

(اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ ......لَمْ يَعْلَمْ)

এভাবে পাঁচটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। (সহীহ বুখারী হা. ৩)

(اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ)

এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা নাবী (সাঃ)-কে সম্বোধন করেছেন তবে এ সম্বোধনে উম্মাতের সবাই শামিল। কেননা শরীয়তের অন্যতম একটি সূত্র হলো

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

যে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র করে কোন আয়াত বা সূরা অবতীর্ণ হয় তাহলে সে নির্দিষ্ট পেক্ষাপট ধর্তব্য নয় বরং ধর্তব্য হলো শব্দের ব্যাপকতা। আর এ পড়ালেখা হবে আল্লাহ তা'আলার নামে অর্থাৎ দীন ও শরীয়তের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। এতে সাধারণ পড়ালেখা শামিল নয়। যারা এ আয়াত দ্বারা সাধারণ পড়ালেখার কথা বুঝিয়ে থাকেন তারা মূলত নিজ স্বার্থেই করে থাকেন। যে হাদীসে বলা হয়েছে প্রত্যেক মুসলিমের জ্ঞান অর্জন করা ফরযÑসে হাদীসটিও দীনি শিক্ষা অর্জনের ব্যাপারে। সাধারণ শিক্ষাকে ইসলাম নিষেধ করেনি বা বাধাও দেয়নি তবে অবশ্যই মুসলিম মাত্রই ফরয জ্ঞান অর্জন করতেই হবে। অন্যথায় গুনাহগার হতে হবে।

خَلَقَ الْإِنسٰنَ مِنْ عَلَقٍ

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে।

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخٰلِقِينَ

পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি জমাট বাঁধা রক্তে, অতঃপর মাংসপিন্ডকে পরিণত করি হাড্ডিতে, অতঃপর হাড্ডিকে আবৃত করি মাংস দিয়ে, অতঃপর তাকে এক নতুন সৃষ্টিতে উন্নীত করি। কাজেই সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কতই না মহান!

خالق এর আসল অর্থ নুতনভাবে কোন সাবেক নমুনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করা যা আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ। এই অর্থের দিক দিয়ে خالق একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা-ই। কিন্তু মাঝে মাঝে خالق ও مخليق শব্দ কারিগরীর অর্থেও ব্যবহার করা হয়। কারিগরীর স্বরূপ এর বেশী কিছু নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কুদরাত দ্বারা এই বিশ্বে যেসব উপকরণ ও উপাদান সৃষ্টি করে রেখেছেন, সেগুলোকে জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরে মিশ্রণ করে এক নতুন জিনিস তৈরী করা। একাজ কারও কারও দ্বারা হওয়া সম্ভব। তখন এর অর্থ হবে, উদ্ভাবন করা, আকৃতি প্রদান করা, গঠন করা ইত্যাদি। এ অর্থেই কুরআনের অন্যত্র ইবরাহীম আলাইহিসসালামের মুখে এসেছে,

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا

"তোমরা তো আল্লাহ্ ছাড়া শুধু মূর্তিপূজা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ।" [সূরা আল-আনকাবূতঃ ১৭] অনুরূপভাবে ঈসা আলাইহিসসালামও বলেছেনঃ

ۖأَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ

“আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পাখিসদৃশ আকৃতি গঠন করব; তারপর ওটাতে আমি ফুঁ দেব; ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে ওটা পাখি হয়ে যাবে।” [সূরা আলে ইমরানঃ ৪৯] তাছাড়া আল্লাহ্ তা‘আলা নিজেও ঈসা আলাইহিসসালামকে তার উপর কৃত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে বলেনঃ

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي

“আপনি কাদামাটি দিয়ে আমার অনুমতিক্রমে পাখির মত আকৃতি গঠন করতেন এবং ওটাতে ফুঁক দিতেন, ফলে আমার অনুমতিক্রমে ওটা পাখি হয়ে যেত” [সূরা আল মায়েদাহঃ ১১০] এসব ক্ষেত্রে خلق শব্দ কারিগরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সৃষ্টির অর্থে নয়। [দেখুন, বাগভী; কুরতুবী]

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

পাঠ কর, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল।

এখানে পড়ার আদেশের পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, প্রথম আদেশটি নিজে পাঠ করার আদেশ, আর দ্বিতীয়টি অন্যকে পাঠ করানো বা অন্যের নিকট প্রচারের নির্দেশ। [ফাতহুল কাদীর] অতঃপর মহান রব আল্লাহ্র সাথে الأكرم। বিশেষণ যোগ করার মধ্যে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মানুষ সৃষ্টি করা এবং তাদের শিক্ষাদান করার নেয়ামতের মধ্যে আল্লাহ্ তা‘আলার নিজের কোন স্বার্থ ও লাভ নেই; বরং এগুলো তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই দান। তিনি সর্বমহান দানশীল ও মহামহিমান্বিত। [আদ্‌ওয়াউল বায়ান, মুয়াস্সার]

الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে,

মানব সৃষ্টির কথা বর্ণনার পর এখানে মানুষের শিক্ষার প্রসঙ্গটি উল্লেখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি মানুষকে কলমের মাধ্যমে তথা লেখার শিক্ষা দান করেছেন। তা না হলে মানুষের মধ্যে জ্ঞানের উন্নতি, বংশানুক্রমিক ক্রমবিকাশ সম্ভব হত না। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, পূর্ববর্তীদের জীবন-কাহিনী, আসমানী-কিতাব সব কিছুই সংরক্ষিত হয়েছে লেখনির মাধ্যমে। কলম না থাকলে, দ্বীন এবং দুনিয়ার কোন কিছুই

পূর্ণরূপে গড়ে উঠত না। [ফাতহুল কাদীর] হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা যখন প্রথম সবকিছু সৃষ্টি করেন, তখন আরশে তার কাছে রক্ষিত কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ করেন যে, আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল থাকবে।" [বুখারী: ৩১৯৪, ৭৫৫৩, মুসলিম: ২৭৫১] হাদীসে আরও বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেন এবং তাকে লেখার নির্দেশ দেন। সেমতে কলম কেয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব লিখে ফেলে। " [মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩১৭]

(عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) আল্লাহ তা'আলা মানুষকে মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ করেন এমনভাবে যে, তার জ্ঞান বলতে কিছুই থাকে না। জন্মের পর মানুষ যাতে জ্ঞান অর্জন করতে পারে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা দুটি উপকরণ প্রদান করেছেন।

১. হিফয বা মুখস্থ করে জ্ঞানায়ত্ত করা। এর জন্য প্রয়োজন দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও অনুধাবন শক্তি। আর এসব কিছু আল্লাহ তা'আলা জন্মগতভাবেই দিয়েছেন।

২. লেখনির মাধ্যমে জ্ঞানার্জন। তাই আল্লাহ তা'আলা লেখার উপকরণ হিসাবে কলম দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন :

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ : اكْتُبْ

প্রথমে আল্লাহ তা'আলা কলম সৃষ্টি করেছেন তারপর বললেন : তুমি লেখ। (আবূ দাঊদ হা. ৪৭০০)

(عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

মানুষকে আল্লাহ তা'আলা জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে অজানা জিনিসকে শিক্ষা দেন। মানুষ জানত না কোন্টা সঠিক, কোন্টা বেঠিক, কোন্টা আকাশ, মাটি, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি এবং এসব কী ও কেন সৃষ্টি হয়েছে? মানুষ জানত না

কম্পিউটার আবিস্কার করতে, রকেট তৈরি করতে, গাড়ি তৈরি করতে। আল্লাহ তা'আলা সব কিছু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে জানালেন।

عَلَّمَ الْإِنسٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না,

পূর্বের আয়াতে ছিল কলমের সাহায্যে শিক্ষা দানের বর্ণনা। এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রকৃত শিক্ষাদাতা আল্লাহ্ তা'আলা। মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহ্র কাছ থেকেই সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। [সা'দী] কলমের সাহায্যে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তিনি এমন সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা মানুষ জানত না। কেউ কেউ বলেন, এখানে মানুষ বলে আদম আলাইহিস্ সালামকে বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভিন্ন বস্তুর নাম ও গুনাগুন শিক্ষা দিয়েছেন। যেমনটি সূরা আল-বাকারায় বর্ণনা করা হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর]

অর্থাৎ মানুষ আসলে ছিল সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। আল্লাহর কাছ থেকে সে যা কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। আল্লাহ যে পর্যায়ে মানুষের জন্য জ্ঞানের দরজা যতটুকু খুলতে চেয়েছেন ততটুকুই তার জন্য খুলে গিয়েছে। আয়াতুল কুরসীতে একথাটি এভাবে বলা হয়েছেঃ

وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ

"আর লোকেরা তাঁর জ্ঞান থেকে তিনি যতটুকু চান তার বেশী কিছুই আয়ত্ব করতে পারে না।" (আল বাকারাহ ২৫৫ ) যেসব জিনিসকে মানুষ নিজের তাত্বিক আবিষ্কার বলে মনে করে সেগুলো আসলে প্রথমে তার জ্ঞানের আওতায় ছিল না। আল্লাহ যখন চেয়েছেন তখনই তার জ্ঞান তাকে দিয়েছেন। মানুষ কোনক্রমেই অনুভব করতে পারেনি যে, আল্লাহ তাকে এ জ্ঞান দান করছেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল সেগুলোর আলোচনা এখান পর্যন্ত শেষ। যেমন হযরত আয়েশার (রা.) হাদীস থেকে জানা যায়ঃ এই প্রথম অভিজ্ঞতাটি খুব বেশী কঠিন ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ এর চাইতে বেশী বরদাশত করতে পারতেন না। তাই তখন কেবল এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে যে, তিনি যে রবকে প্রথম থেকে জানেন ও মানেন তিনি সরাসরি তাঁকে সম্বোধন করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অহীর সিলসিলা শুরু হয়ে গেছে এবং তাঁকে তিনি নিজের নবী বানিয়ে নিয়েছেন। এর বেশ কিছুকাল পরে সূরা আল মুদ্দাসসিরের প্রথম দিকের আয়াতগুলো নাযিল হয়। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে, নবুওয়াত লাভ করার পর এখন কি কি কাজ করতে হবে।

(৭৪-মুদ্দাস্সির) :

এর প্রথম সাতটি আয়াত পবিত্র মক্কা নগরীতে নবুওয়াতের একেবারে প্রাথমিক যুগে নাযিল হয়েছিল। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণিত বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী এবং মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থের কোন কোন রেওয়ায়াতে এতদূর পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, এগুলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল হওয়া সর্বপ্রথম আয়াত। কিন্তু গোটা মুসলিম উম্মাহর কাছে এ বিষয়টি প্রায় সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বপ্রথম যে অহী নাযিল হয়েছিল তা ছিল اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযি খালাক) থেকে مَا لَمْ يَعْلَمْ (মালাম ইয়া'লাম) পর্যন্ত। তবে বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতসমূহ থেকে একথা প্রমাণিত যে, এ প্রথম অহী নাযিল হওয়ার পর কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হয়নি। এ বিরতির পর নতুন করে আবার অহী নাযিলের ধারা শুরু হলে সূরা মুদ্দাস্সিরের এ আয়াতগুলো থেকেই তা শুরু হয়েছিল। ইমাম যুহরী এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন এভাবে:

"কিছুকাল পর্যন্ত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল বন্ধ রইলো। সে সময় তিনি এতো কঠিন মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন যে, কোন কোন সময় পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখান থেকে নিজেকে নীচে নিক্ষেপ করতে বা গড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হতেন। কিন্তু যখনই তিনি কোন চূড়ার কাছাকাছি পৌঁছতেন তখনই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর সামনে এসে বলতেন: 'আপনি তো আল্লাহর নবী' এতে তাঁর হৃদয় মন প্রশান্তিতে ভরে যেতো এবং তাঁর অস্বস্তি ও অস্থিরতার ভাব বিদূরিত হতো।" (ইবনে জারীর)

এরপর ইমাম যুহরী নিজে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহর রেওয়ায়তেই এভাবে উদ্ধৃত করেছেন:

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম فَتْرَةِ الْوَحْيِ (অহী বন্ধ থাকার সময়)-এর কথা উল্লেখ করে বলেছেন: একদিন আমি পথে চলছিলাম। হঠাৎ আসমান থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম। ওপরের দিকে তাকিয়েই দেখতে পেলাম হেরা গিরা গুহায় যে ফেরেশতা আমার কাছে এসেছিল সে ফেরেশতা আসমান ও যমীনের মাঝখানে একটি আসন পেতে বসে আছে। এ দৃশ্য দেখে আমি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং বাড়ীতে পৌঁছেই বললাম: আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। আমাকে চাদর দিয়ে আচ্ছাদিত করো। সুতরাং বাড়ীর লোকজন আমাকে লেপ (অথবা কম্বল) দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করলো। এ অবস্থায় আল্লাহ অহী নাযিল করলেন: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ "এরপর অব্যাহতভাবে অহী নাযিল হতে থাকলো।" (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)।

প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রচার শুরু হওয়ার পর প্রথমবার মক্কায় হজ্বের মওসুম সমাগত হলে সূরার অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ ৮ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত নাযিল হয়। 'সীরাতে ইবনে হিশাম' গ্রন্থে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।